সুরমা নদীর গাংচিল

অরিন্দম নাথ

গত ১৪ ই ডিসেম্বর ছিল হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্মদিন । তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রচনাটি পোস্ট করছি ।

হবিগঞ্জের জালালী কইতর
সুনামগঞ্জের কুরা
সুরমা নদীর গাংচিল আমি
শূন্যে দিলাম উড়া ।
শূন্যে দিলাম উড়া রে ভাই, যাইতে চান্দের চর
ডানা ভাইঙ্গা পড়লাম আমি কইলকাত্তার উপর ।
তোমরা আমায় চিনছনি ।

গানের লাইনগুলো হেমাঙ্গ বিশ্বাসের । সিলেটের এই প্রখ্যাত গণ-সংগীত শিল্পীকে চেনা আমার বাবার হাত ধরে । আমার সদ্য-প্রয়াত বাবার জন্ম তখনকার পূর্ব-বঙ্গের সিলেট জেলার হবিগঞ্জ মহকুমায় । বাবা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষক । কলেজ জীবনে প্রথম ভর্তি হয়েছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে । কিন্তু বিজ্ঞান শাখায় সুযোগ না পেয়ে চলে যান বঙ্গবাসী কলেজে । সেখান থেকেই স্নাতক । বাবা শেষদিকে কানে কম শোনতেন । বার্ধক্যজনিত কারণে । তিনি একটি গানের কলি প্রায়ই গুনগুন করতেন-'মুরগী ক্যারক্যারায় ক্যারক্যারায় আন্ডা পাড়ে না....।'

এ`টি ছিল তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি । গানটি গণনাট্য সংঘের । বাবা ছাত্রজীবনে দীর্ঘদিন কলকাতায় কাটিয়েছেন । হয়তো গণনাট্য সংঘের সংস্পর্শে এসেছেন । ভাবতাম এই ভাবেই গানটি

শিখেছেন । একদিন ঘটনাচক্রে গণনাট্য সংঘের কয়েকটি বই হাতে এসেছিল । দেখলাম গানটির রচনাকাল বাবার কলেজ জীবনের অনেক আগে । বাবার কাছে কথাটি পাড়লাম । তাঁর ছাত্রজীবন সম্বন্ধে বলতে অনুরোধ করলাম । বাবার কথায়-

বাবা হবিগঞ্জ হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন । স্কুলের সাথেই ছিল প্রখ্যাত গণ-সংগীত শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বাড়ি । তিনি বাবার চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন । একই স্কুলের ছাত্র । তাঁর এক ভাই পড়তেন বাবার সাথে । তাঁর নাম বাবার মনে নেই । তবে সহপাঠী শ্যামসুল কিব্রিয়ার নাম মনে করতে পারতেন । তিনি ছিলেন বাবার মতই তুখোড় ছাত্র । বাংলাদেশের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী । ২০০৫ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি খুন হন । হবিগঞ্জের বৈদ্যর বাজা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে তাঁর জনসভায় দুষ্কৃতিরা গ্রেনেড হামলা করে । বাবার কথায়, স্কুলে যেতে আসতে হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও তাঁর সাথীদের সাথে দেখা হত । হেমাঙ্গ বিশ্বাস তখন স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত । তাঁর গলাতেই 'মুরগী ক্যারক্যারায় ক্যারক্যারায় আন্ডা পাড়ে না....।'গানটি শুনেছেন । সেই থেকেই বাবার মনে গানটি গেঁথে গিয়েছিল ।

বাবার সাথে এই কথোপকথনের পর হেমাঙ্গ বিশ্বাস সম্বন্ধে জানার আগ্রহ জাগে । ২০১২ সালে সারা দেশে তাঁর জন্ম-শতবার্ষিকী পালিত হয়েছিল । তাঁকে নিয়ে প্রচুর লেখালেখি হয়েছিল । তাঁর রচনা সংগ্রহ আমার পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল । সেই সুবাদে সিলেটের লোক-সংগীতের এক বিশাল দুনিয়া আজ আমার কাছে উন্মুক্ত হয় । আমার আক্ষেপ, আমি সংগীতের স্বরলিপি, পূর্ণস্বর, অর্ধস্বর, কোমলস্বর, আরোহণ, অবরোহণ প্রভৃতি পরিভাষা বুঝি না । কিন্তু এই সুরের মন্থন করতে গিয়ে বুঝতে অসুবিধা হয় না, যান্ত্রিক পরিবেশে এসে কেন শিল্পী গেয়ে উঠেন-

হাওরের পানি নাইরে হেথায়,
নাইরে তাজা মাছ
বিলের বুকে ডালা মেলা,
নাইরে হিজল গাছ
বন্ধু নাইরে তাজা মাছ ।
তবু নিদহারা নগরের পথে
রাইতে দুপুরে
মরমীয়া ভাটিয়ালি
আমার গলায় ঝর
তোমরা আমায় চিনছনি ।

লোক সংগীতে নিরিখে অবিভক্ত বাংলাকে তিনটি অঞ্চলে ভাগ করা যায় : ভাটিয়ালি প্রধান পূর্ববঙ্গ, ভাওয়াইয়া প্রধান উত্তরবঙ্গ, বাউল প্রধান মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ । ভাটিয়ালি প্রধান পূর্ববঙ্গকে আবার সূক্ষ্ম সূর-বিচারে জেলাগত অনুবিভাগ করা হয় । যেমন- ময়মনসিংহের ঢঙ, ত্রিপুরার ঢঙ, শ্রীহট্টের ঢঙ ইত্যাদি । ভাটিয়ালি নদী-নৌকা-মাঝি কেন্দ্রিক গান । সারিগানও তদ্রূপ । ভাটিয়ালি একক গান । সারিগান কোরাস । সারিগান মাঝি-মাল্লারের শ্রমের গান । উদ্দেশ্য কাজে উৎসাহ ও প্রেরণা পাওয়া । ভাটিয়ালি শ্রমহীন অবসর সময়ের গান । ভাটিয়াল মাঝির অবসরের অলস মুহূর্তের গান বলে সুর ও লয় বিলম্বিত । এই গানের সুর টানা চড়া গলায় শুরু হয় এবং অনেকক্ষণ পড়ে শমে এসে শেষ হয় । শান্ত নদীর স্রোতের সাথে কোথায় যেন এর মিল ধরা পড়ে ।

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের কথায়, 'শ্রীহট্টের ভাটিয়ালির একটি সাংগীতিক বিশেষত্ব আছে । ভাটিয়ালিতে রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে । তার আদিম রূপটি ছিল বাস্তব জীবনের ব্যথা ও কথা, নদী ও নৌকা, প্রকৃতি ও প্রেম । পরে এল দার্শনিকতা । নদী হল জীবন-নদী । নৌকা হল দেহ-তরী । তেমনি সুরের ক্ষেত্রেও ক্রমবিবর্তন আসে ।

গান নিয়ে তাঁর গবেষণার ধন শিল্পী উজাড় করে দিয়ে গেছেন । অনেক গান সংগ্রহ করেছেন । ভিন্ন ভিন্ন সুরের ও রাগের । তাঁর সংগ্রহ করা একটি ভাটিয়ালি গানের উল্লেখ করছি –

কালো মেঘে সাজ কইর্যাছে,
পরান তো মানে না;
সাবধানে চালাইও তরী
নাও যেন ডুবে না ।।

শ্রীহট্টের লোক-সংগীতে দু`টি ভাবধারা দেখা যায় । একটি বৈষ্ণব, অপরটি সূফী । বৈষ্ণব ধারাটি মূলত এক তারযুক্ত 'লাউয়ের সাথে গাওয়া হয় । বৈষ্ণব ধারার একটি গান, রাধারমণের রচনায়-

রাই-বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না,
মইলো গো রাই কাঁচা সোনা-

সূফী ধারাটি গতি-প্রধান । দোতারা ও খমক সহযোগে গাওয়া হয় । অনেকে এই ধারা দু`টিকে হিন্দু-ধারা ও মুসলমান-ধারা বলে উল্লেখ করেন । কিন্তু দু`টিই হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত সংস্কৃতি । পশ্চিমবঙ্গের বাউল গানের ছন্দের সাথে সুফীগানের খুব মিল । বাউলগান নৃত্য-সম্বলিত । ডুগি ও খমক সহযোগে গাওয়া হয় । শিল্পীর কথায়, বাউল গানেরও শ্রীহট্ট কিংবা ত্রিপুরা-ময়মনসিংহের ভাটিয়ালির প্রভাবে রূপান্তর ঘটেছে । ঢাকার নরসিংদির বাউলেরা বাউল গানে 'সারিন্দা'ব্যবহার করে । ফলে বাউল সম্প্রদায়ের নাচের ছন্দ হারিয়ে যায় ।

শ্রীহট্টের সূফীদের 'মারিফতী'গানে পশ্চিমবঙ্গের বাউল গানের সাদৃশ্য পাওয়া যায় । শ্রীহট্ট মারিফতীদের পীঠস্থান । শ্রীহট্ট শ্রীগৌরাঙ্গেরও পিতৃভূমি । কিন্তু শ্রীহট্ট জেলায় বৈষ্ণবের আখড়ার চেয়ে পীরের 'মোকাম বা 'দরগা বেশি । পূর্ববঙ্গে বহু ফকির-কবির জন্ম হয়েছে । তাঁদের উপর শাহজালালের প্রভাব পড়েছে । শাহজালালের(১২৭১-১৩৪৬) আদি বাড়ি ইয়েমেনের কুন্যায় । অল্প বয়সে মক্কায় মামার কাছে তাঁর ইসলাম ধর্মে দীক্ষা । মামার সাথে তিনশো ষাট জন অনুগামীকে নিয়ে এদেশে ধর্ম প্রচারে আসেন । শ্রীহট্ট, ঢাকা, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন । তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে সিলেটের দরগা মহল্লায় সমাধিস্থ করা হয় । প্রতিবছর উড়সের সময় শাহজালালের দরগায় পীর-আউলিয়াদের সমাগম হয় । শাহজালালেরই উত্তরসূরি শ্রীহট্টের আকবর আলী, আরকুম শাহ, ইরপান, উম্মর পাগল, মজাইদ চন্দা, শেখ বানু, হাছন রাজা, আরো অনেকে । রবিঠাকুর তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায় পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য কবির দার্শনিকতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হাছন রাজার 'আমার আঙ্খি হৈতে পয়দা হইল আসমান-জমিন'গানটির শরণ নিয়েছিলেন ।

পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলায় জন্ম হয়েছিল প্রখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের । তাঁর বৈশিষ্ট্য ছিল একই গান লোক সংগীত এবং উচ্চাঙ্গ-সংগীতের সুরে গাওয়া । তাঁর একটি বিখ্যাত গান : 'নিরলে কইয়ো গিয়া বন্ধুয়ার লাগ পাইয়া ।'

আমাদের দেশর মেয়েরা পোশাক পরিচ্ছদের মধ্য দিয়ে নিজেদের স্বকীয়তা ধরে রেখেছে । বাংলার প্রতিটি জেলায় মেয়ের সেখানকার আঞ্চলিক ছড়া, ব্রত, ইত্যাদি নিজস্ব রীতিতে গায় । তবে লৌকিক নৃত্য মেয়েদের অবস্থান খুব দীন । ব্যতিক্রম সিলেটের মেয়েদের ধামাইল । বংশ পরম্পরায় সিলেটি মেয়েরা এই প্রাণবন্ত নাচটি ধরে রেখেছে । এই ধামাইল কন্যা দেখা, মঙ্গলাচরণ, পানখিলি, জলভরা, অধিবাস, সোহাগমাখা, দধিমঙ্গল, বিবাহ, কন্যাযাত্রা প্রভৃতি পর্বেই গাওয়া হয় । একটি ধামাইলের উল্লেখ করছি-

আমি কী হেরিলাম জলের ঘাটে
গিয়া নাগরী গো,
আমি কী হেরিলাম জলের ঘাটে গিয়া
হেরি মুখ চান্দে
পড়িয়াছি ফান্দে-
প্রাণপাখি কান্দে রইয়া রইয়া নাগরী গো ।

শ্রীহট্টের 'হোরীগান'লোকসংগীতে অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে । যেমন-

আজ হোরী খেলব রে শ্যাম
তোমার সনে,
একলা পাইয়া
হেতা নিধুবনে ।।

শিল্পী হেমাঙ্গ বিশ্বাসের রচনা সংগ্রহ একটি সময়ের দর্পণ । এই বই পড়তে গিয়ে আমার মত সংগীতে অর্বাচীন লোকও আগ্রহী হয়ে পড়ে । যার উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই প্রবন্ধ । তাঁর সাথে গলা মলয়ে বলতে ইচ্ছে করে-

এই সুরে ওরে বন্ধু অশথ বটের ছায়া
এই সুরে বিছাইয়া দেয়রে শীতল পাটির মায়া
বন্ধু অশথ বটের ছায়া ।
এই ন সুরের পালের দোলায়
খুশির হাওয়া বয়,
এই সুরের দৌলতে আমি
জগৎ করলাম জয়
তোমরা আমায় ছিনছনি ।।

'সুরমা নদীর গাংচিল'আপনি আমার প্রণাম নেবেন । আপনার কথা স্মরণে এলে আমার প্রয়াত পিতা গর্বে উদ্বেল হয়ে উঠতেন । আমাদের ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরায় আজ আর গাংচিলের দেখা মিলে না । হয়তো তাদের খোঁজ মিলবে 'খোয়াই নদীর অববাহিকায় সিলেটে । তবে জালালী কইতরের দেখা সর্বত্র

মিলে । তারা সিলেটের রাষ্ট্রদূত । ভাওয়াইয়া আজো বেঁচে আছে । বেঁচে থাকবে । বাড়ির বয়স্করা যখন উচ্চৈঃস্বরে কাউকে ডাকেন, কেন জানি ভাওয়াইয়ার সুর মনে আসে । এই ডাকও চড়া গলায় শুরু হয়ে দীর্ঘক্ষণ পরে শমে নেমে আসে ।